সমকাল

তারিখ ০২ SEP 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সমাপনী পরীক্ষা ও কোচিং

মোহাম্মদ ফারুক

শিক্ষা এমন হওয়া দরকার, যা গোটা সমাজকে ধারণ-করবে আবার পুরো সমাজও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করবে। সমাজ বাস্তবতার মৌলিক দিকগুলো বিবেচনায় না এনে যদি শিক্ষা কার্যক্রম সাজানো হয়, তাহলে তার অবস্থা হবে সেই শিয়ালের 'গল্পের মতো: যে খাবারের লোভে গাছের কোঠরে প্রবেশ করে আর খাওয়া শেষে বের হতে পারে না। কারণ তার শারীরিক সীমানা অনেক বেড়ে যায়। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন এই পেট মোটা শিয়ালের মতো অস্বস্তির বেড়াজাল থেকে বের হতে পারছে না।

সম্প্রতি 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে' শিরোনামে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত বছর দেশের ৮৬ দশমিক তিন শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক। অথচ ২০০০ সালে ৩৯ দশমিক চার শতাংশ বিদ্যালয়ে কোচিং করানো হতো। কোচিং-নির্ভরতা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২০০৯ সালে চালু হওয়া প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এখন ঘরে-বাইরে, ঘাটে-মাঠে সর্বত্র কোচিং ব্যবসা চলছে জমজমাটভাবে। বিদ্যালয়গুলোতে বছরে গড়ে ৪১২ ঘণ্টা কোচিং করানো হয়। ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই কোচিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে সাজানোর সাময়িক চিত্র এটি। পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চালু করার পেছনে বহুবিধ উদ্দেশ্য ছিল। আগে পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় সব শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারত না। এই বৈষম্য দূর করার জন্য সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়। তাছাড়া এর মাধ্যমে সৃজনশীলতার বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মনোযোগী করানো।

প্রশ্ন হলো, এর মধ্য দিয়ে বৈষম্য কমছে না আরও বাড়ছে? শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় মনোযোগী হচ্ছে, নাকি এই দৌড়ে তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আবার এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা সৃজনশীল হচ্ছে, নাকি এর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে– তা ভাবা দরকার। কারণ তাদের এখন স্কুলের তুলনায় কোচিংয়ের প্রতি ঝোঁক বেশি। মূল বইয়ের চেয়ে গাইড বইয়ের প্রতি আগ্রহ অন্তহীন। অন্যদিকে শিক্ষকরাও আগ্রহের সঙ্গে কোচিংয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছেন। শিক্ষকদের অপ্রতুল বেতন, দরিদ্রতা, বেকারত্ব আমাদের সমাজ বাস্তবতার রূপ। এগুলো এড়িয়ে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা জেনেবুঝে ব্যর্থ হওয়ারই নামান্তর। সমাপনী পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আরও পরনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা অনুসরণ করে পরীক্ষকরা উদারভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। নিবন্ধনের সময় দুর্বল পরীক্ষার্থীদের সবলদের মাঝখানে রেখে তালিকা তৈরি করে উপজেলা কার্যালয়ে পাঠানো হয়। উপজেলা কার্যালয় থেকে এর কোনো পরিবর্তন করা হয় না। এর ফলে পরীক্ষার সময় সবলদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে দুর্বল পরীক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়– পরিদর্শকরা পরীক্ষার হলে ছাড় দেওয়া, শিক্ষার্থীদের সহায়তা ইত্যাদি।

কোচিং-নির্ভরতা, প্রাইভেট, পাবলিক পরীক্ষার চাপ আর সৃজনশীলের কলা ঝুলিয়ে রাখার কারণে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের তুলনায় পাবলিক পরীক্ষায় কীভাবে জিপিএ ৫ পাওয়া যায় সেই চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা হয় না। এ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীদের একটি অংশের বাধাহীন অসদুপায় অবলম্বন আর নকলের ছড়াছড়ি অন্যদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সুতরাং সময় এসেছে শিক্ষা ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নিয়ে পুনরায় ভাবার।

● শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়